তৃতীয় অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নিসর্গ বর্ণনার ভাষা

তৃতীয় অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নিসর্গ বর্ণনার ভাষা

শিল্প সাহিত্যে প্রকৃতির ভূমিকা প্রশ্নাতীত। আবহমানকাল থেকেই প্রকৃতি-প্রসঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে ভিন্নমাত্রা সংযোজন করে এসেছে। প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য ও রহস্যময়ী সত্তা মানবমনকে আবিষ্ট করেছে বারবার—নিসর্গের বিপুলতা ও রহস্যগন্ধে মানবচিত্ত তৃপ্ত হয়েছে চিরকাল। সাহিত্যে তাই নিসর্গভাবনা বিবিধ লেখকের রচনাশিল্পের একটি প্রিয় প্রসঙ্গরূপে সমাদর পেয়ে এসেছে। প্রকৃতি বর্ণনার ভাষা শিল্পীর রঙ-তুলিতে বর্ণময় চিত্রধর্মিতা পেয়েছে বারবার। প্রকৃতির মোহিনী যাদু স্পর্শে ভাবা ব্যঞ্জনাময় ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে। সাহিত্য সজীব প্রাণময় সত্তা পেয়েছে। পাঠক-হৃদয় তাই মোহিত না হয়ে পারেনি।

সমালোচকের ভাষায় বলা যায় যে *'পৃথিবীর সাহিত্যে প্রকৃতি সেই কোন বিস্মৃতকাল থেকে স্থান পেয়ে এসেছে। আদিম পৃথিবীর সঙ্গে তার ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধন। তখন নগর ছিল না, সভ্য মানুষ ছিল না, নাগরিক জীবনের এত বিচিত্র উপকরণের সামান্য ভগ্নাংশও ছিল না। ছিল শুধু আকাশ, অরণ্য, পাহাড়, আর ধূ ধূ মাঠ। এই প্রকৃতিই ছিল তখন শিল্প প্রেরণার প্রধানতম উপকরণ। তারপর প্রাচীন সভ্যতার ক্রমশ উদ্ভব হয়েছে, মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তখনও কাব্যে, গানে, গল্পে প্রকৃতি অসীম প্রভাব বিস্তার করে আছে। রামায়ণে, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এ মেঘদূতে উত্তর রামচরিতে প্রকৃতি চেতনার অজস্র স্বাক্ষর।'*[১]

সৃষ্টিশীল সাহিত্যের দুটি প্রধান উপাদানই হল মানুষ আর প্রকৃতি জগৎ। দুটি সত্তার অভিন্নতায় সাহিত্য পূর্ণতা লাভ করে। সৃজনীমূলক সাহিত্য অবিমিশ্র মানুষ অথবা প্রকৃতি অবলম্বন করে নির্মিত হতে পারে না। উপন্যাস যদি মানবজীবনের গদ্য রূপায়ণ হয় সেক্ষেত্রে মানুষের পাশাপাশি নিসর্গও সেখানে সমগুরুত্ব পায়। ভাষাশিল্প বর্ণিত প্রকৃতিকে রঙে রেখায় এঁকে চলে। উপন্যাসের ভাষা

তুচ্ছতামুক্ত হয়ে অসাধারণ দ্যোতনা লাভ করে।

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে প্রকৃতি জগৎ তার নিজ-ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চর্যাপদে সাধক কবিগণও জীবন প্রবাহকে দুরন্ত বেগে প্রবাহিত নদীর সঙ্গে উপমিত করেছেন আবার কখনও বা শবর-শবরীর প্রেমালাপ ও তাদের মিলনোল্লাস প্রকৃতির অনুষঙ্গে উচ্ছ্বসিত করেছেন।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বৈষ্ণব কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির ও মানব-হৃদয় নিবিড় একাত্মতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। কবিরা অপরূপ ভাষা প্রয়োগে নিসর্গের প্রেক্ষিতে মানবমনের গহনতম প্রদেশকে তুলে ধরেছেন —'মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া'[২]—বিশেষণ '*মত্ত*'ও '*ফাটি যাওত*'—যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহারে প্রিয় বিরহে প্রেমিকার বিদীর্ণ হৃদয় ও প্রকৃতি জগতের মত্ততা একই সুরে অনুরণিত হয়েছে।

আধুনিক সাহিত্য উপন্যাসে বিচিত্র সমস্যায় আকীর্ণ জীবন ও মানুষের চরিত্র রহস্য গহন অরণ্যের মতোই জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। সেখানে সেই জটিলতাকে অস্বীকার করে প্রকৃতির লীলা বর্ণনায় মগ্ন থাকা এক ধরনের অসম্ভবই বলা যায়। তবু জীবনধর্মী মানুষ প্রকৃতির প্রতি নিবিড় আকর্ষণ বোধ করে, প্রকৃতির রূপ-রসের নিবিড় আস্বাদ পেতে চায় তাই মানবজীবনের রূপায়ণ উপন্যাসের প্রকরণে, প্রকৃতি নব নব ভাবে ভাষাশিল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

উপন্যাস সাহিত্যের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিসর্গ প্রকৃতির অবতারণা করেছেন রোমান্স রস সৃজনের উদ্দেশ্যে। রোমান্সের বর্ণময় লীলা চিত্রণে শিল্পী মগ্ন ছিলেন। তাঁর উপন্যাসে তাই দেখা যায় নরনারীর হৃদয় অনুভব বহিঃপ্রকৃতির বর্ণোজ্জ্বল সৌন্দর্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উপন্যাসের আবহ নির্মাণে উজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছে। *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসটিতে সমুদ্র তীরবর্তী অরণ্যভূমির চিত্র ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—'*ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রকলা নীরবে ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন — আকাশ প্রান্তর সমুদ্র সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত* সমুদ্র গর্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।'[৩] বর্ণনাংশটি ছোটো সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যে গঠিত হয়েছে। নিসর্গজগতের অতীন্দ্রিয় রূপের অনির্বচনীয় মূর্তি ধ্রুপদী ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী এ-বাক্যবন্ধন রচিত। *শিশিরাকাশ, নক্ষত্র মণ্ডলী, জনহীন, সমুদ্রগর্জন* ইত্যাদি

সমাসবদ্ধ পদ ও *কল্লোলিত, কদাচিৎ* ইত্যাদি তৎসম অলংকৃত শব্দে নির্জন বেলাভূমির ভয়াবহ সৌন্দর্যরূপ চিত্রিত হয়েছে। এ সাধুগদ্য কাব্যময় স্পন্দনে অনুরণিত হয়েছে।

অপর উপন্যাস *বিষবৃক্ষে* মানব-হৃদয় ও প্রকৃতিজগতের অচ্ছেদ্যতা শিল্পী ভাষায় তুলে ধরেছেন —*'রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাকচিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে — তৎপশ্চাতে আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে।'*[৪]—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটা কাটা বাক্যাংশে গঠিত বর্ণনায় যৌগিক বাক্যবন্ধে *খদ্যোৎ* ইত্যাদি তৎসম শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মানব জীবনের ভয়াবহ ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত কালো রাত্রির পটভূমিকায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। কুন্দনন্দিনী চরিত্রের হৃদয়ের নিষিদ্ধের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ শিল্পী প্রকৃতির পটভূমিকায় ভাষায় ব্যঞ্জিত করেছেন।

প্রকৃতি কখনও আখ্যানের অংশ হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। *দেবীচৌধুরাণী* উপন্যাসে নদী অপরিসীম ভূমিকা নিয়েছে। এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু যেন নদী। প্রকৃতি জগৎ কাহিনির নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে। ভাষায় তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—*'বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জল—প্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে।'*[৫] —ছোটো ছোটো বাক্য নদীর প্রবহমানতার মতোই এ গদ্য গতিসম্পন্ন চলমান। প্রকৃতি বর্ণনায় কাব্যিক স্পন্দন জ্যোৎস্না রজনীর বিশেষণ 'বড় মধুর একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণ' ইত্যাদি প্রয়োগে দ্যোতিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নগরজীবন প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু তার কবি সত্তা নগরজীবনে যেখানে প্রকৃতি জগতের অবারিত প্রবেশের অবকাশ কম, সেখানেও হঠাৎ পুষ্প সুরভিত বসন্ত বাতাসে অথবা দূরাগত কোকিলের ডাকে আনমনা মনের বিধূরতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নগরীর কর্ম ব্যস্ততায় আলোড়িত যান্ত্রিক আবর্তে ঘূর্ণ্যমান ক্লিষ্ট জীবনযাত্রায় নিসর্গের চকিত মধুর স্পর্শ বুলিয়েছেন। ভাষাতে সেই স্নিগ্ধ সজীব প্রাণময় সাহচর্য ধরা পড়ে।

মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতি জালের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতি চেতনার মায়াস্পর্শ বিচিত্র জীবন বেদনায় যে ব্যঞ্জনাময় রূপে আভাসিত হয়ে ওঠে—'চোখের বালি' উপন্যাসে দমদমে বাগানবাড়ির প্রাকৃতিক প্রতিবেশে লাস্যময়ী চটুলা বিনোদিনীর অন্তরের পূজারিণী মূর্তিটি উন্মোচিত হয়েছে প্রকৃতির অনুষঙ্গে। বিনোদিনীর দীর্ঘদিনের মুখোশ খুলবার জন্য তার বিস্মৃত আত্মপরিচয়কে উন্মোচিত করবার জন্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ সাহচর্যের প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতি জগতের উপস্থিতি লেখক ব্যঞ্জনাময় ভাষায় তুলে ধরেছেন—*'ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্মরিত করিয়া চলিয়া গেল ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জাম গাছের ঘন পত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল।'*[৬]—যৌগিক বাক্যে সাধু গদ্যে 'উষ্ণ মধ্যাহ্ন' 'তরুপল্লব' 'মর্মরিত' ইত্যাদি কৃদন্ত শব্দের প্রয়োগে নির্জন দুপুরের প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়েছে 'ক্ষণে' শব্দটির পুনরাবৃত্তিতে ও 'মর্মরিত করিয়া' সংযোগমূলক ক্রিয়া ও 'চলিয়া গেল' যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারে প্রকৃতি বর্ণনায় গতিময়তা এসেছে—প্রবহমান গ্রীষ্মের দুপুরের বাতাস যেন ভাষায় অনুভূত হচ্ছে।

'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ গোরার হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ প্রকৃতির অনুষঙ্গে তুলে ধরেছেন — *'আজ কিন্তু নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারংবার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে আর কতকগুলি দীপহীন নিস্তব্ধ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্ধ্বে বৃহস্পতিগ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মত তিমির ভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।'*[৭]—এ সাধু গদ্যের স্বচ্ছন্দ প্রসন্নতা লক্ষণীয়। যৌগিক ও সরল ক্ষুদ্র বাক্যে নিসর্গ বর্ণনা চরিত্রের অন্তর্নিহিত নিবিড় উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছে। নক্ষত্রলোক *অভিষিক্ত, দীপহীন, তিমিরভেদী, কালিমা* ইত্যাদি তৎসম শব্দ প্রয়োগ প্রকৃতি বর্ণনাকে রূপময় করে তুলেছে। গদ্যভাষা কবিতা হয়ে উঠেছে। সর্বত্র প্রকৃতি যেন ভাষায় মন্দ্রিত হয়েছে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আবহনির্মাণে প্রকৃতির সহায়তা নিয়েছেন। প্রকৃতিবর্ণনের ভাষাটি হল এই—*'নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝরঝর শব্দে উপরে নীচে মিলিয়ে প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। ... আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজর গুলার ভিতর দিয়া বারবার*

বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মত হু হু করিয়া চিৎকার করিতেছে।[৯] এই উপন্যাসেরই অন্যত্র প্রকৃতির জান্তব উপস্থিতি সংবেদনাত্মক ভাষায় বর্ণিত—*'চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউ গুলাও তেমনি। তারা যেন শূণ্যতার পাহারাওয়ালা গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে। ... যেন মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।*[৯]—মানবহৃদয়ের বিচিত্র মনোগত ভাবনা ও সম্পর্কের টানাপোড়েন জাতীয় অনুভব প্রকৃতির আবহে লেখক তুলে ধরেছেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও সমাসোক্তি অলংকার ব্যবহারে প্রকৃতি বর্ণনা চিত্রণ হয়ে উঠেছে। এ গদ্য ভাষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্তর্লীন মরমি ভাষার দৃষ্টান্ত। শব্দের ধ্বনির সংগতি ও বাক্যাংশের ধ্বনির সংগতি গদ্যভাষায় ছন্দময় স্পন্দন এনেছে। স্বচ্ছন্দ পরিমিত গদ্য ব্যবহারে প্রকৃতি বর্ণনার ভাষা অনুপ্রাসের মত বেজে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের শিল্পী সত্তায় প্রকৃতি মগ্নতা বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু ভিন্ন ছিল। প্রকৃতিকে তিনি বিচিত্র ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। মানবজীবনের বিশেষ অবস্থার পটভূমিরূপে তিনি নিসর্গকে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির রঙ ও রসের সঙ্গে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির গূঢ় সম্পর্ককে তিনি গড়ে তুলেছেন।

রোমান্টিক কবি-আবেগ যা প্রকৃতিপ্রীতিতে অভিব্যক্ত হয়, শরৎচন্দ্রের শিল্পী সত্তায় তা ধরা পড়েনি। এ বিষয়ে তিনি নিজে মন্তব্য করেছেন শ্রীকান্তের জবানীতে—*'ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা কবিত্বের কম্পটুকু দেন নাই। এই দুই পোড়া চোখ দিয়া আমি যাহা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। ... চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারও মুখটুকুও নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টিও করা চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা।'*[১০]

বস্তুত বলা যায় মানুষের দুঃখ বেদনা রিক্ততা ও ব্যর্থতা দেখাবার জন্যই তিনি লেখনী ধারণা করেছিলেন। সে জন্য বাইরের জগতের শান্ত সুন্দর কবিত্বময় রূপ ফুটিয়ে তোলার অবকাশ তাঁর ছিল না। নিজের সাহিত্যবোধ সম্পর্কে লিখেছেন—*'কিন্তু জানোই ত ভাই বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনে। তাই কবিতা যে কেউ লেখে তার পানেই আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নিজে না পারি দুছত্র মেলাতে না পারি ভাল কথা খুঁজে বার করতে।'*[১১]

নিজ কবিত্ব শক্তির অভাব সম্পর্কে তিনি যাই বলুন না কেন প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যিক যতই বস্তুবাদী হোক না কেন কল্পনাশক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ না থাকলে তাঁর শিল্পসৃষ্টি কখনও সার্থক হয় না। এই গুণ শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মূলে ও উৎসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। মানুষের বেদনাপীড়িত ও অশ্রুসিক্ত জীবনের বর্ণনা দিলেও যখনই সুযোগ এসেছে তখন তাঁর অন্তরের প্রচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে প্রকৃতি জগতের প্রতি তাঁর কবিত্বময় অনুরাগ বর্ণ সমারোহে ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। সেখানে এই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তা শুধুই বিষয়বস্তুর সঙ্গেই সংগতি রক্ষা করেছে তা নয়, লেখকের শিল্প সৌন্দর্য চেতনাকেও ব্যক্ত করেছে। পাঠক বর্ণনায় মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর *শরৎচন্দ্র* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন—*'শরৎচন্দ্রের রচনার বাস্তবতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু বাস্তবপ্রিয়তার সঙ্গে যে কবিত্বপ্রতিভা জড়িত আছে তার প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে না। শ্রীকান্ত বলিয়াছে যে তাহার মধ্যে ভগবান কল্পনা কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। কিন্তু একথা সত্য নহে শ্রীকান্তের সম্বন্ধেও নয়, তাহার স্রষ্টার সম্বন্ধে তো নয়ই বিশ্ব প্রকৃতির মহিমার প্রতি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি চিরনিবদ্ধ রহিয়াছে, এই দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির মত বিরাট বিস্তার নাই, কিন্তু অনন্য সাধারণ তীক্ষ্ণতা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি মানবহৃদয়ের গভীরতম বেদনার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছেন এবং ইহাই বিশ্বপ্রকৃতিকে সজীব করিয়াছে।'*[১২]

নিছক নিসর্গ বর্ণনা ও মানবহৃদয় সংশ্লিষ্ট নিসর্গ বর্ণনা—দুই শ্রেণির প্রকৃতি বর্ণনাই শরৎ সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতি বর্ণনার ভাষাও শরৎচন্দ্রের মৌলিকতার অনন্য হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-কর্মের প্রায় সবকটিতেই নিসর্গের অল্প-বিস্তর প্রেক্ষিত লক্ষণীয়—যা ভাষাশিল্পে নব নব মাত্রা সংযোজন করেছে।

বড়দিদি উপন্যাস—যেটি শরৎচন্দ্রের প্রারম্ভিক পর্বের রচনা—সেটিতে নিসর্গের ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ পাঠককে মুগ্ধ করেছে —*'তরতর ছলছল করিয়া নৌকা ছুটিয়াছে। ছইয়ের ভিতর সুরেন্দ্রের মুখের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে।'*[১৩]—মুমূর্ষু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ ব্যবধানে বড়দিদি মাধবীর সাক্ষাৎ পর্বের পটভূমি সৃষ্টি করেছে চন্দ্রালোকিত রজনী। 'তরতর' 'ছলছল' অনুকার শব্দগুলি ভাষায় প্রবাহমানতা এনেছে। সরল বাক্যে সাধারণ সাধু গদ্যে প্রকৃতির স্নিগ্ধ মৃদু স্পর্শে হৃদয়ের অবরুদ্ধ আবেগ বাঙ্ময় হয়েছে। প্রকৃতির ভাষা দুটি হৃদয়ের সেতু হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দ পুরের পল্লী প্রকৃতির প্রভাব তার বিবিধ উপন্যাসে ধরা পড়েছে। ছায়াবীথি পুষ্পিত তরুলতা, শীর্ণানদী, পাখির কলতানে মুখর গ্রাম বাংলার চেনা ছবি সরস ও সংবেদনশীল ভাষায় শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন।

সরস্বতী নদী যেটি হুগলি জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে তার ক্ষীণকায় রূপ *'বিরাজ বৌ'* উপন্যাসে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে আবার তার পাশাপাশি মানবহৃদয়-সংশ্লিষ্ট অনুভবের সার্থক প্রতিবিম্ব রূপ হিসাবে তার ব্যঞ্জনাময় উপস্থিতি ভাষায় পাই —*'এই বাগানটির এক প্রান্ত দিয়া শীর্ণকায়া সরস্বতী নদীর মৃদু স্রোতটুকু গঙ্গাযাত্রীর শ্বাসপ্রশ্বাসের মত বহিয়া যাইতেছিল। সর্বাঙ্গে শৈবালে পরিপূর্ণ শুধু মাঝে মাঝে গ্রামবাসীর জল আহরণের জন্য কূপ খনন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই আশেপাশে শৈবাল মুক্ত অগভীর তলদেশে বিভক্ত শুক্তিগুলি স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া অসংখ্য মাণিক্যের মত সূর্যলোকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল।'*[১৪] সহজ সাধুগদ্যে সরল ও যৌগিক বাক্যবন্ধে উপমা অলংকারের সুপ্রয়োগে বর্ণনা রূপময় হয়ে উঠেছে। 'শীর্ণকায়' 'কূপ' 'শুক্তি', 'মাণিক্য' 'সূর্যালোক' তৎসম শব্দগুলির সুপ্রয়োগ ভাষাকে চিত্রধর্মিতা দিয়েছে ও *জ্বলিয়া উঠিতেছিল* —এই যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার জলধারা দীপ্তিময়ী প্রবহমানতা পেয়েছে। সাধারণ নগণ্য নদী বর্ণনাগুণে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। —হুগলি জেলার সপ্তগ্রামের নদীকেন্দ্রিক জনজীবনের প্রসঙ্গে নদীর বর্ণনাময় উপস্থাপন এই উপন্যাসে প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছে।

এই উপন্যাসেরই অন্যত্র অপমানিতা নিগৃহীতা নারীর জগৎ সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় গ্রহণে প্রকৃতি জগতের সঙ্গে মানব-মনের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে যা ভাষাকে সংবেদনশীল করে তুলেছে।—*'বৈশাখের সেই শীর্ণকায় মৃদু প্রবাহিণী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কুল ভাসাইয়া চলিয়াছে। নীচে গভীর জলরাশি সুদৃঢ় প্রাচীর ভিত্তিতে ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া চলিয়াছে, সেইদিকে একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের নীচে কালো পাথর মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন কালো আকাশ সুমুখে কালো জল চারিদিকে গভীর কৃষ্ণ স্তব্ধ বনানী।'*[১৫]—খণ্ড খণ্ড বাক্যাংশে বিবৃত সাধু গদ্যে নিসর্গ বর্ণনাটি গদ্যে বাক্যবন্ধের কাঠামোয় ছন্দময়তা সৃষ্টি করেছে। সরস্বতী নদী ও তার পরিবেশের ভয়ংকর কৃষ্ণরূপ মানব-হৃদয়ের আত্মহত্যা প্রবৃত্তির ভয়াবহ কালোকে আরো গাঢ়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। প্রকৃতি জগতের ভয়াবহ ভীষণতা ও বন্য উদ্দামতা *কৃষ্ণ, স্তব্ধ, বনানী, প্রবাহিনী, ক্ষীণকায়া, আবর্ত* ইত্যাদি তৎসম শব্দ চয়নে

গতিহীন স্তব্ধ হয়ে উঠেছেও অজানা আশংকাময় ভবিষ্যৎ জীবনের ভয়াবহতাকে তুলে ধরেছে। *পরিণীতা* উপন্যাসে নিসর্গ জগৎ দুটি নরনারীর হৃদয়ের নিবিড় বন্ধনে সহযোগী হয়ে উঠেছে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যে গ্লানিমুক্ত ও নির্মল—কথাশিল্পী সেটিকে শুভ্র জ্যোৎস্না প্লাবিত রজনীর আবহে ভাষায় তুলে ধরেছেন—*'তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল'*[১৬]—যৌগিক বাক্যবন্ধে সহজ সাধু গদ্যে নিসর্গের প্রসন্নময় ঔদার্য 'উঠিয়াছিল' যৌগিক কাল পুরাঘটিত অতীত ক্রিয়াপদ ব্যবহারে ও 'ভাসিয়া গিয়াছিল'—যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহারে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'উঠিয়া' ও 'ভাসিয়া'—এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ অনুপ্রাসের মতো সাধু গদ্যভাষায় বেজে উঠেছে।

*'পণ্ডিত মশাই'*উপন্যাসে কথাশিল্পী প্রকৃতির ব্যবহার প্রচলিত ভাবে না করলেও চরিত্রের মানস জগতের পটভূমি-রূপে নিসর্গের সামান্য আভাস রেখেছেন যা অল্প হলেও মন ছুঁয়ে যায় —'মাঘ শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিয়া পড়িল, চরণ সেই যে গিয়াছে, আর আসিল না।'[১৭]—যৌগিক বাক্যবন্ধে সাধুগদ্যে *হইয়া* অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারে কুসুমের সন্তান বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের নিঃস্বতা ঋতুর পরিবর্তনের আবহে ধরা পড়েছে।

*'পল্লীসমাজ'*উপন্যাসে প্রকৃতি প্রসঙ্গ মানব-হৃদয় সঙ্গে এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট যে তাকে আলাদা ভাবে নির্ণয় করা যায় না—*'বাহিরে বসন্ত জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছিল সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ তাহার রমাকে মনে পড়িল'*[১৮]—প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে মানব-হৃদয় যাবতীয় ভুল ভ্রান্তি ও তুচ্ছতা ভুলে যায় ও নিজেকে নবভাবে আবিষ্কার করে অভিভূত হয়। জেল থেকে ফিরে আসা রমেশের বিষণ্ণ মন প্রকৃতির উদাত্ততায় সঞ্জীবিত হয়েছে ও হৃদয়ের গভীরে থাকা প্রচ্ছন্ন প্রেমকে প্রকৃতির সংস্পর্শে আবিষ্কার করেছে। যৌগিক বাক্যে *বসন্ত জ্যোৎস্না* ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদের সুপ্রয়োগের পাশাপাশি *ভাসিয়া* ও *চাহিয়া* অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধুভাষাকে সংবেদনশীল করেছে— এ-গদ্যভাষায় কাব্যিক স্পন্দন অনুভূত হয়।

এই উপন্যাসের অন্যত্র প্রকৃতির আবহে মানব মনের উন্মীলন ঘটেছে এ ভাষায়—*'তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে নববর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্ন আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল। অর্ধ নিমীলিত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল'*[১৯]—মেঘমেদুর ছায়াচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরের রমেশের একান্ত

নিবিড় প্রেম অনুভব বাইরের প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হতে চেয়েছে—সাধুগদ্যে সহজ অনাড়ম্বর ভাবে এ বর্ণনা রচিত মধ্যাহ্ন আকাশের বিশেষণ হিসাবে **নববর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘ** ইত্যাদির প্রয়োগে ভাষা চিত্রগ্রাহ্যতা পেয়েছে—'অর্ধনিমীলিত'— এই সমাসবদ্ধ পদটি ভাষায় মন্থরতা এনে দিয়েছে, যা মেঘের মতই গতি-মন্থর।

অরক্ষণীয়া রচনাটিতে প্রকৃতির প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে বা পৃথক ভাবে জায়গা নেয়নি। মানব-মনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি জনিত হিসেব-নিকেশ উদার প্রকৃতির সংস্পর্শে ঘটেছে। দুটি বেদনাপীড়িত হৃদয় বহু যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে প্রকৃতির সংস্পর্শে একাত্ম হল—বর্ষায় ভরা জাহ্নবীর পবিত্র সাহচর্যে অস্ত সূর্যের মহান প্রস্থান কালে। —*'তখন সূর্য ঢলিয়া পড়িতেছিল'*[২০] ছোটো সরল বাক্যে *ঢলিয়া* অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগে ভাষা যেন অসমীত্ব পেয়েছে।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে নিসর্গজগৎ কখনও কাহিনির প্রতিবেশ রচনা করেছে আবার তার পাশাপাশি মানব-হৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

প্রকৃতির শুধুই যে মাধুর্যময় রূপই একমাত্র সত্য তা নয় তার পাশাপাশি তার ভীতিকর আপাত অসুন্দর মূর্তিও যে দৃশ্যমান—সেটি শ্রীকান্ত উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ চিত্রণে শরৎচন্দ্রের দক্ষতা সম্পর্কে সমালোচক বক্তব্য রেখেছেন—*'প্রকৃতির ভীতিকর মূর্তিকে রূপময় করার অনন্য সাধারণ ক্ষমতা ছিল শরৎচন্দ্রের। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নিশীথাভিযানের বর্ণনায় শ্মশান রাত্রির বর্ণনায় এবং সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনায় সে ক্ষমতার পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান।'*[২১]

শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব উপন্যাসে কথাশিল্পী ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের মাছ চুরি করতে যাবার প্রসঙ্গে নিশীথ রজনীর প্রকৃতি চিত্রিত করেছেন—*'খাড়া কাঁকড়ের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ মূর্তিমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সূচিভেদ্য, আঁধার তলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া, উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে।'*[২২] সাধু স্বচ্ছন্দ গদ্যে 'সূচিভেদ্য' পর্বত, 'জলস্রোত' ইত্যাদির পাশাপাশি 'মাথা' 'আঁধার', 'হাত' ইত্যাদি তদ্ভব শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যে প্রকৃতি বর্ণনাটি বিবৃত হয়ে প্রকৃতির ভয়ংকর অথচ সুন্দর রূপটিকে চিত্রিত করেছে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ *খাইয়া, রচিয়া, হইয়া* ইত্যাদির ব্যবহারে সাধু ভাষা জলস্রোতের মত প্রবহমান

হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে এই প্রকৃতি বিষয়ক ভাষা-ভাবনা। অন্ধকার তামস রজনীর প্রেক্ষিতে গঙ্গার রূপের বিশেষত্ব ভাষায় কাব্যিক স্পন্দন এনেছে— *'বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প নিঃস্তব্ধ নিশিথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে।'*[২৩]—প্রকৃতি জগতের বন্য আগ্রাসী ভীষণা মূর্তিটি ভাষায় প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে। বিশেষণ পদের সুপ্রয়োগ সাধু ভাষাকে বিশেষত্ব দিয়েছে। *বায়ুলেশহীন, নিঃষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ* ইত্যাদি বিশেষণ পদ ব্যবহারে ভাষা অনুভবগম্য হয়ে উঠেছে। নিশিথিনী রাত্রির সঙ্গে কালীমূতি উপমিত হয়ে উৎপ্রেক্ষা অলংকারের সার্থক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। গদ্যভাষা কবিতা হয়ে উঠেছে।

'*শ্রীকান্ত*' উপন্যাসের প্রথম পর্বে অমাবস্যা রজনীর অন্ধকার পটভূমিকায় শ্মশানভূমি আশ্চর্য সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে।—*'সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে মনে হইল এগুলো যেন এক একটা মানুষ আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে এবং বালুকার আস্তরণের উপরে যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়াছে ও নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ, সংখ্যাতীত গ্রহ তারকারাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে।'*[২৪] —সাধু গদ্য অলংকৃত ভাবে উপস্থাপিত হয়ে প্রকৃতি জগৎকে মানবিক করে তুলেছে। *অমানিশা, প্রেতাত্মা* ইত্যাদি তৎসম বিশেষ এই শব্দগুলির ব্যবহার বর্ণনাকে ভয়ংকর রূপ দিয়েছে। উৎপ্রেক্ষা ও সমাসোক্তি অর্থালংকারের প্রয়োগে ভাষা সজীব ও প্রকৃতি জগৎ মানবিক হয়ে উঠেছে। ভাষা ছবি হয়ে উঠেছে। সরল ও জটিল বাক্যবন্ধে বিবৃত অংশটি শরৎচন্দ্রের ভাষাশৈলীর আশ্চর্য সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

'*শ্রীকান্ত*' দ্বিতীয় পর্বে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বর্ণনার ভাষাটি পাঠককে অভিভূত না করে পারেনি। শ্রীকান্তের মুগ্ধ বিহ্বল চিত্তের অভিব্যক্তি —*'একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না, কারণ তা হইলে হিমালয়ের যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে সেই অপরিমেয় গতিশক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।... এখন যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূরই এই আলোকমালা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।'*[২৫] সমুদ্রের

অগাধ অতল মহান গম্ভীর বিস্ময়কর সৌন্দর্য সাধু ধ্রুপদী গদ্যে জটিল ও ~~যৌগিক ও সরল~~ বাক্যে গঠিত মিশ্র বাক্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এই অসীম অনন্ত সৌন্দর্যের উপযোগী শব্দ চয়ন করেছেন লেখক। *অচিন্তনীয়, বিরাটকায়, মহাতরঙ্গ, রজতশুভ্র, কিরীট* ইত্যাদি তৎসম শব্দ চয়নে লেখকের সচেতনতা লক্ষণীয়। ভাষায় দার্শনিক ভাবনা প্রকাশিত। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের একাধিক বার ব্যবহার 'হইয়া' 'করিয়া' 'ছুটিয়া' 'জ্বালিয়া' ইত্যাদির প্রয়োগে ভাষা গতিশীলতা পেয়েছে। জীবন সম্পর্কিত নিগূঢ় অনুভব শিল্পীর নিসর্গ বর্ণনায় ব্যঞ্জিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের অন্য পর্বে মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতি জগতের একান্ত সংশ্লিষ্টতাকে শিল্পী সংবেদনাত্মক ভাষায় তুলেছেন যা মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। শ্রীকান্ত চরিত্রের জীবন-পথে চলায় অসীম ভ্রান্তি ও নিঃসঙ্গ জীবনের বিধুরতাকে প্রকৃতির প্রতিকল্পে তুলে ধরেছেন শিল্পী তাঁর অনবদ্য ভাষায় —*'অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতি বাবলা গাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন একটা বাঁশঝাড় এমনি একটা ব্যথা ভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝিবা আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে।'*[২৬] উত্তপ্ত নির্জন গ্রীষ্মের পল্লীপ্রকৃতির রিক্ততা ও শ্রীকান্ত চরিত্রের ব্যথাভরা বিষণ্ণতাময় দীর্ঘশ্বাস যেন ভাষায় একাকার হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতি জগতের দূরত্ব ঘুচে গিয়ে মনের অন্দরে আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে যেন। জটিল বাক্যবন্ধের বিবৃত সাধু গদ্যটি যে ছন্দোময় হয়ে উঠেছে। *'তপ্ত বাতাস', 'বাঁশঝাড়', 'ব্যথাভরা' 'দীর্ঘশ্বাস'* শব্দ চয়নে গদ্যভাষা অন্তরের উপলব্ধিজাত কবিতা হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসের এই পর্বে অন্যত্র গঙ্গামাটি গ্রামের পথ দিয়ে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের চলার পথে পড়ন্ত বেলায় নিসর্গ জগৎ দুটি হৃদয়ের নিবিড় বন্ধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। ভাষা যেন প্রকৃতি বর্ণনাকে ছাপিয়ে আবেদনময়াত্মক হয়ে উঠেছে।—*'আজ সারাদিনটাই কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়াছিল। অপরাহ্ন-সূর্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবর্তী একঝাড় বাঁশ ও গোটা দুই তেঁতুল গাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল'*[২৭] —সাধু গদ্য ভাষা সরল ও যৌগিক বাক্যবন্ধে বিবৃত হলেও অন্তর্লীন মরমি ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে *মেঘলাটে গোছের, অপরাহ্ন-সূর্য* ইত্যাদি শব্দগুলি ভাষাকে ব্যথাভরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

করেছে। সুদূর আকাশের গোলাপী ছায়া ও মাটির তেঁতুল গাছে ও বাঁশঝাড়ের মেশামেশি উৎপ্রেক্ষা অলংকারে ব্যঞ্জিত হয়েছে। মন ও বহির্জগৎ অস্তযূর্যের শেষ-বেলাকার আলোয় একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। গদ্যভাষায় কাব্যিক স্পন্দন-সৃজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দক্ষতাকেই তুলে ধরে। এই প্রসঙ্গে Marjorie Boulton থেকে উদ্ধৃত করা যায়— 'One of the difference between mediocre and great prose, in that great prose has fine rhythm. The reader may perhaps be surprised at the associations of rhythm with prose.'[২৮]

শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে বঙ্গদেশের পল্লীপ্রকৃতির যে স্নিগ্ধ সরস ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই শরৎ সাহিত্যে তার তুলনা আর যেন নেই। সমালোচক ড. অজিত কুমার ঘোষ তাঁর জীবনশিল্পী *শরৎচন্দ্র* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন—*'বিভূতিভূষণের মতই শরৎচন্দ্র এখানে পল্লীপ্রকৃতির প্রতিটি গাছ লতাপাতা গুল্ম ফুল ও পাখীর খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন। ... গহরের বাগানে এবং কমললতার পুষ্প বৃক্ষবেষ্টিত ও কাকলি মুখরিত আশ্রমিক পরিবেশে ফুল লতা পাতা ও পাখীর অজস্র.* সমাবেশের মধ্যে লেখক আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন।'[২৯] এই উপন্যাসের প্রকৃতি বর্ণনার একটি দৃষ্টান্ত — 'অজস্র ফুটন্ত মল্লিকায় সমস্ত বাগানটা যেন সাদা হইয়া আছে। সামনের পাতা ঝরা ন্যাড়া চাঁপা গাছটায় ফুল নাই, কিন্তু কাছাকাছি কোথায় বোধ করি অসময়ে প্রস্ফুটিত গোটাকয়েক রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে সে ত্রুটি পূর্ণ হইয়াছে।'[৩০] — এ প্রকৃতি বর্ণনার সাধু ভাষার স্বচ্ছন্দতা আমাদের মুগ্ধ করে।

এই উপন্যাসের অন্যত্র প্রকৃতি বর্ণনায় লেখক মানব হৃদয়ের গভীরতম বেদনাকে সংযোজিত করে ভাষাকে সজীব করে তুলেছেন অজস্র জায়গায়।

গভীর-রাত্রিতে পিয়ারী বাঈজীর বুক ফাটা ক্রন্দনের বর্ণনা দিয়েছেন প্রকৃতির অনুষঙ্গে —*'শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মুখ তুলিয়া চাহিলাম সমস্ত বাড়িটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন। কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাঈজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।'*[৩১]—ছোটো ছোটো বাক্যাংশে গ্রথিত দীর্ঘ সাধু গদ্যে রাত্রির প্রাণময় উপস্থাপনায় সমাসোক্তি অলংকারে ভাষা ব্যঞ্জিত হয়েছে। *কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া* ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্বপ্রয়োগ ভাষায় অনুপ্রাসের মতো অনুরণিত হয়ে আবেদনময় মরমি হয়ে উঠেছে। ভাষা মানব-হৃদয়ের

অন্তঃস্থলের গভীরতম প্রদেশ ছুঁতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকৃতি জগতের সঙ্গে মনোজগতের নিবিড় সংলগ্নতা 'শ্রীকান্ত' *চতুর্থ পর্বে* খুঁজে পাওয়া যায়। বাল্যবন্ধু গহরের মৃত্যু সংবাদ শুনে নির্বান্ধব গৃহে শ্রীকান্ত উপস্থিত হয়েছে। সেই নির্জন নিঃসঙ্গ শূন্য বহুস্মৃতি মাখানো গৃহ ও বাইরের প্রকৃতি জগৎ যুগপৎ শ্রীকান্তের চিত্তকে উন্মনা করে তুলেছে। ভাষায় তারই আভাস পাই —*'আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপিয়া একটা কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে, তাহারই কোন একটা সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথে অস্তোন্মুখ সূর্যরশ্মি রাঙ্গা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর সংলগ্ন সেই শুষ্কপ্রায় জাম গাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও মাধবীলতার কুঞ্জ।*'[৩২]—এ সাধুভাষা সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে প্রবাহিত। নিঃসঙ্গ মানবহৃদয়ের বেদনার্তি ও প্রকৃতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। 'দীর্ঘ দিনমান' 'অস্তোন্মুখ', 'সূর্যরশ্মি' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগ প্রকৃতির অনন্ত কালপ্রবাহকে তুলে ধরেছে। অতীত স্মৃতিমেদুরতার ভারে ভাষা মন্থরতা পেয়েছে। ভাষার এই শ্লথ-মন্থরতা নিসর্গ জগতের অনন্ত অসীম মন্থর গতির সঙ্গে সাযুজ্যময় হয়ে উঠেছে।

'*চরিত্রহীন*' উপন্যাসে সমুদ্রের রূপ বর্ণনা করেছেন শিল্পী আশ্চর্য সুন্দর ভাষায়। নিসর্গ বিশেষ মাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। মহাতরঙ্গ ভয়ংকর সুন্দর রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে ভাষায় —*'জাহাজের গায়ে উদ্দাম তরঙ্গ উন্মাদের মত ঝাঁপাইয়া পরিতেছে, চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে আবার ছুটিয়া আসিয়া আবার মিলাইতেছে।*'[৩৩] —মহতরঙ্গকে উন্মাদের সঙ্গে উপমিত করে ভাষায় উদ্দামতার স্পর্শ লেগেছে। সাধু ধ্রুপদী গদ্যে যৌগিক বাক্যবন্ধে, অসমাপিকা ক্রিয়াপদ 'ঝাঁপাইয়া' 'হইয়া' 'মিলাইয়া' ইত্যাদির প্রয়োগ ভাষাকে প্রবল গতিময়তা দিয়েছে। সাধু ভাষায় সমুদ্রের কল্লোলমুখর গতি অনুভূত হয়। সমুদ্রের তাণ্ডব মূর্তির সঙ্গে সমুদ্র-যাত্রী দুই মানব-মানবীর দিবাকর ও কিরণময়ী হৃদয়গত প্রবৃত্তিঘন আকর্ষণ-বিকর্ষণ মথিত অন্তরের তীব্র সংরাগ সংশ্লিষ্ট হয়েছে। নিসর্গ ও মানব-হৃদয়ের মত্ততা একাকার হয়েছে ভাষায়।

এই উপন্যাসের অন্যত্র প্রকৃতিজগতের আলোকিত অসীমতা ভাষায় অসাধারণভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে —*'আকাশের কোন এক অদৃশ্য প্রান্ত হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফূরিত হইতেছিল, তাহারই আলোকচ্ছটায় সম্মুখের গাঢ় মেঘ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, চাহিয়া উপেন্দ্রের যেন কিছুতেই আর*

সাধ মিটে না এমনি মনে হইতে লাগিল।[৩৪]—মৃত্যুশয্যায় শায়িত উপেন্দ্র শেষবারের মতো জানালার বাইরে আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে অধীর হয়েছে। তার মনের অপূর্ণ আশা আকাশের মেঘের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে। জটিল বাক্যে দীর্ঘ সাধুগদ্যে ভাষা তুচ্ছতা মুক্ত হয়ে মহিমময় হয়েছে—'স্ফূরিত' 'আলোকচ্ছটা' 'উদ্ভাসিত' ইত্যাদি শব্দ চয়নে তারই আভাস পাওয়া যায়। মৃত্যুপথযাত্রীর জীবনতৃষ্ণা প্রকৃতি দর্শনের আকুতির মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হতে চেয়েছে। দরদী কথাশিল্পী প্রকৃতিজগৎ ও মানবমনকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন। এ বাঁধন ছিন্ন হবার নয়।

'*দত্তা*' উপন্যাসেও মানব-হৃদয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে উঠেছে প্রকৃতিজগৎ। প্রকৃতিজগৎ মানব-হৃদয় বহির্ভূত কোনো পৃথক সত্তা যেন নয়। একে অপরের পরিপূরক। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিজয়া যখন পথ দিয়ে ফিরে চলেছে তখন তার শূন্য মতের প্রতিফলন বাইরের প্রকৃতি-জগতে ধরা দিয়েছে। ভাষা এই সাদৃশ্য সূত্রকে তুলে ধরেছে এ ভাবে —*'তাহার পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া কাছে দূরে যাহা কিছু দেখা যায়—আকাশ প্রান্ত গ্রামান্তরের বনরেখা নদী জল যেন নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিমঝিম করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, পরিচয় নাই, কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গেছে।*'[৩৫] জড় অচেতন প্রকৃতি সমাসোক্তি অলংকারে উচ্ছ্বসিত হয়ে সচেতন সত্তা পেয়েছে। বাইরের প্রকৃতি জগৎ ও অন্তরের মথিত বিষণ্ণতা-বোধ হয়েছে ভাষায়। বিচ্ছিন্নতা-বোধ তথা সর্বত্র জগৎ-সংসারের একটা সংযোগহীনতা নিসর্গ জগতের উপকরণ 'আকাশ', 'গ্রামান্তরের বনরেখা' ও 'নদী জল' প্রত্যক্ষ করে বিজয়ার হৃদয় গুমরে মরেছে।

এই উপন্যাসেই মানব-মন প্রকৃতির স্নিগ্ধ আবহে কেমন ভাবে প্রসন্নতায় ভরে ওঠে, প্রকৃতির কোমল স্পর্শের সজীবতা কীভাবে যাবতীয় অসম্পূর্ণতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে ভাষায় সেটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে — 'ঘন্টা দুই পরে তাহাকে ফুল ও চন্দনে সজ্জিত করিয়া নলিনী বধূর আসনে বসাইয়া সম্মুখে বড় জানালাটা খুলিয়া দিতেই তাহার লজ্জিত মুখের উপর দক্ষিণের বাতাস এবং আকাশের জ্যোৎস্না যেন একই কালে তাহার স্বর্গত মাতাপিতার আশীর্বাদের মত আসিয়া পড়িল।'[৩৬] — দক্ষিণের বাতাস ও আকাশের জ্যোৎস্না পিতামাতার আশীর্বাদের সঙ্গে উপমিত হয়ে ভাষাকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে, উৎপ্রেক্ষা অলংকারে প্রকৃতি বর্ণনা দ্যোতনাময় হয়ে উঠেছে। দক্ষিণের বাতাস, ফুল, চন্দন, জ্যোৎস্না ইত্যাদি শব্দ চয়নে সাধুগদ্যে প্রকৃতির প্রসন্নময় উজ্জ্বল উপস্থিতি ভাষায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে প্রকৃতি জগৎ অন্যত্র চরিত্রের স্মৃতিপথে বিবৃত হয়ে ভাষাকে বর্ণময়তা এনে দিয়েছে —*'আমাদের ফুলবাগানের ধারের ছোট নদীটি এতক্ষণ সোনার জলে টলটল করে উঠেছে। আর তার পরপারে বাঁশবনের আড়াল থেকে সূয্যিঠাকুর এখনো যাই যাই করেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেননি।*'[৩৭] —চলিত গদ্যে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ভাষা প্রবাহিত হয়েছে। 'টলটল' ধ্বন্যাত্মক শব্দটির প্রয়োগ ও 'সূয্যিঠাকুর' কর্মধারায় সমাসে ভাষা ছবি হয়ে উঠেছে। 'সোনার জল' ইত্যাদিতে বিশেষণ পদ 'সোনা'-র প্রয়োগ অস্তসূর্যের শেষ রক্তিমাভা ভাষাকে চিত্রধর্মিতা এনে দিয়েছে। প্রকৃতি বর্ণনার ভাষায় অকৃত্রিম আন্তরিকতা সংবেদনময় হয়ে উঠেছে।

আবার পল্লীবাংলার প্রকৃতি সহজভাবে বিবৃত হয়েছে এ ভাবে—এ উপন্যাসে—'তখন শরৎকালের অবসানে সরস্বতীর জলধারা শীতলতর হইয়া আসিতেছিল এবং তীরের উপর দিয়া কৃষকদিগের গমনাগমনের পথটিও পায়ে পায়ে শুকাইয়া কঠিন হইয়া আসিতেছিল'[৩৮]—শরৎ অবসানে হেমন্তের কাঠিন্যময় উপস্থাপন ঋতুচক্রে শীতের আগমনকে ত্বরান্বিত করে—এই চিরন্তন প্রকৃতি জগতের সত্য সাধু প্রসাদময় গদ্যে ঝংকৃত। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ 'হইয়া', 'শুকাইয়া' 'দিয়া' ইত্যাদির প্রয়োগ ভাষাকে যেন গতিশীলতা দিয়েছে—ঋতুচক্রে কালের প্রবহমানতা প্রকৃতির ভাষায় লক্ষিত হয়ে উঠেছে।

*'গৃহদাহ'*উপন্যাসে প্রকৃতিজগৎ তার বাহ্যিক দূরত্ব ত্যাগ করে হৃদয়ের গহন প্রদেশে প্রবেশ করেছে। প্রকৃতির স্পর্শে হৃদয়ের অব্যক্ত অস্ফুট অনুভব যেন উন্মোচিত হতে চেয়েছে। *'খোলা দরজা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্যের একঝলক রাঙ্গা আলো সুরেশের মুখের উপর আসিয়া পড়িল।'*[৩৯] সরল বাক্যে *অস্তোন্মুখ* বিশেষণ পদের ব্যবহারে সাধু ভাষা আশ্চর্য সুন্দর রূপ পেয়েছে। সুরেশের হৃদয়ে নব উদ্ভূত প্রেমানুভব রাঙা আলোর স্পর্শে জাগ্রত হয়েছে।

অচলার স্বামী গৃহে যাত্রার পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি জগৎ। তার আসন্ন বিবাহিত জীবনের অতৃপ্তি-জনিত ব্যর্থতা যেন প্রকৃতির আবহে ভাষাময় হয়েছে—*'তাহার পরে শ্রাবণের এক স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রহরে মাথার উপর ক্ষান্ত বর্ষণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও নীচে সঙ্কীর্ণ কর্দমাচ্ছন্ন পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ দিয়ে পালকি চড়িয়া অচলা একদিন স্বামি গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।'*[৪০]—দীর্ঘ সরল বাক্যে সাধু গদ্যে প্রকৃতি বর্ণনা নিছক বর্ণনকর্মেই শেষ হয়নি—চরিত্রের হৃদয়ের অব্যক্ত—

আশঙ্কাময় ভাবনার সঙ্গী হয়েছে। *স্বল্পালোকিত* এই বিশেষণ পদটি দ্বিপ্রহরের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে ও *মেঘাচ্ছন্ন* সমাসবদ্ধ পদটি আকাশের পূর্বে প্রযুক্ত হয়ে সাধু ভাষাকে বিষণ্ণবিধূর করে তুলেছে—ভবিষ্যৎ জীবনের অপ্রাপ্তির আগাম আভাস যেন শ্রাবণের আকাশ বাতাস ও পিচ্ছিল গ্রাম্য পথে মিশে আছে।

এই উপন্যাসেই অন্যত্র উন্মত্ত দুর্যোগপূর্ণ প্রকৃতির পটভূমিকায় নরনারীর হৃদয়ের আদিম অন্ধপ্রবৃত্তির উদ্বেলিত কামনা বাসনাময় ভীষণতাকে কথাশিল্পী তুলে ধরেছেন —*'বাহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া উঠিতে লাগিল সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।'*[৪১] অচলা ও সুরেশ—এই দুটি নরনারীর হৃদয়ের অশান্ত তাণ্ডব বাইরের দুর্যোগপূর্ণ প্রকৃতির মত্ততা ও উদ্ভাসিত বিদ্যুতের আলোয় উন্মোচিত হয়েছে। *তেমনি* অব্যয় এই শব্দটির একাধিকবার প্রয়োগ ভাষায় অনুপ্রাসের মতো ঝংকৃত হয়েছে। যৌগিক সাধুগদ্যে সমাসোক্তি অলংকারে প্রকৃতি বর্ণনা দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। *'লাগিল'* সমাপিকা-ক্রিয়াপদটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে সাধুভাষাকে ছন্দস্পন্দন দিয়েছে।

'দেনাপাওনা' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র অত্যাচারী নির্মম জমিদার জীবানন্দের চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। ষোড়শীর প্রচ্ছন্ন প্রেমের পরশে তার নিঃস্ব হৃদয় ভালবাসার আকাঙ্ক্ষায় কাতর হয়ে উঠেছে। সেই রিক্ত মরু-হৃদয়ের প্রতিরূপ শিল্পী বাইরের প্রকৃতি জগতে প্রতিবিম্বিত করেছেন। ভাষায় তার প্রকাশ অনবদ্য —*'সান্ধ্য আকাশ তলে জনহীন ভূখণ্ডের এই স্তব্ধ বিষন্ন মূর্তি আজ তাহার কাছে অত্যন্ত করুণ ও অদ্ভুত মনে হইল।'*[৪২] —প্রকৃতি বর্ণনাটি সাধু গদ্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। বিশেষণ পদের ব্যবহার সাধু ভাষাকে বহু মাত্রা দিয়েছে। *সান্ধ্য, জনহীন, স্তব্ধ বিষন্ন, জনহীন* ইত্যাদি বিশেষণ পদগুলি সুপ্রযুক্ত হয়ে নিসর্গ বর্ণনাকে বাঙ্ময় করে তুলেছে। নিসর্গ এই উপন্যাসের বিবৃতিময় প্রসঙ্গ নিয়েছে। ভাষায় তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ধ্বনিত হয়েছে। পল্লীবাংলার গ্রীষ্মকালীন শষ্যহীন প্রান্তরের রূপ লেখক সহজভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যার রিক্ত রূপ মানবহৃদয়ের বেদনাময় দীর্ণতার সঙ্গে একাকার হয়েছে —*'একদিকে শীর্ণ নদীর বালুময় শুষ্ক সৈকত আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তে অদৃশ্য হইয়াছে.আর একদিকে বৈশাখের শুষ্ক শস্যহীন বিস্তৃত ক্ষেত্র চণ্ডীগড়ের পাদমূলে গিয়া মিশিয়াছে। পথে পথিক নাই, মাঠে কৃষকদের আর দেখা যায় না, রাখাল বালকেরা*

গোচারণের কাজ আজিকার মত শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেছে'[৪৩] —যৌগিক বাক্যে বিশেষণ পদ ব্যবহারে সাধুভাষা চিত্রময় হয়ে উঠেছে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ভাষা পথের মতো গতিময় হয়েছে। *নাই, না* নঞর্থক অব্যয় যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে প্রকৃতি বর্ণনাটি হাহাধ্বনির মতো বেদনাতুর হয়েছে।

*'পথের দাবী'*উপন্যাসে ব্রহ্মদেশের প্রকৃতি বর্ণনায় একটি অচেনা আবহ নির্মিত হয়েছে। স্বচ্ছন্দ সহজ ভঙ্গিতে ব্রহ্মদেশের নিসর্গ শিল্পী বর্ণনা করেছেন বিস্ময় জনিত মুগ্ধতায় —*'গিরিশ্রেণী অর্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত হইয়া যেন পিছন ও সুমুখের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বিরাট দেহ ব্যাপিয়া কি গভীর বন এবং গগনস্পর্শী কি বিপুলকায় বৃক্ষরাজিই না তাহার সুবিস্তীর্ণ পাদমূল ঘেরিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় সবেমাত্র সূর্যোদয় হয়েছে, বামদিকের শিখর ডিঙাইয়া রথ তাঁহার আকাশে এখনও দেখা দেয় নাই, কিন্তু অগ্রবর্তী কিরণচ্ছটায় উপরের নীল অরণ্যে সোনা মাখাইয়া সেই তাঁহার আসার সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইতে আর বাকী নাই। খাদের মধ্যে শিখর-নিঃসৃত জলের ধারা বহিয়াছে, বনের ছায়ার নীচে তাহার শান্ত প্রবাহ অশ্রুরেখার মতই সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে।'*[৪৪] বিস্ময়বোধক চিহ্নে সাধুগদ্যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে যৌগিক বাক্যবন্ধে প্রকৃতি জগৎ দীর্ঘ বর্ণিত হয়ে ভাব বিহ্বল অভিভূত হৃদয়কে তুলে ধরেছে। পর্বত অরণ্যানী তটিনী বিধৌত ব্রহ্মদেশের প্রকৃতির অনন্যতা শিল্পী সহজ রসের তুলিতে ডুবিয়ে এঁকেছেন। ভাষায় সেই প্রসন্নতার সুর অনুরণিত হয়। জলধারাকে অশ্রুরেখার সঙ্গে উপমিত করে ভাষায় কারুণ্যময় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। আবার *সূর্যোদয়, অগ্রবর্তী, কিরণচ্ছটা, শিখর-নিঃসৃত, গগনস্পর্শী* ইত্যাদি তৎসম শব্দ প্রযুক্ত সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগে ভাষা ধ্রুপদী হয়ে উঠেছে—অপূর্ব চরিত্রের মুগ্ধবিস্মিত হৃদয় প্রকৃতিদর্শনে উদ্ভাসিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে অন্যত্র নিসর্গ জগৎ মানব হৃদয়কে বেদনা বিধূর করে তুলেছে। ভাষায় সেই অন্তর্লীনতা খুঁজে পাওয়া যায়—নদীর ধারে মাটির কেল্লায় পাথরে বাঁধানো ঘাটে বসে নিসর্গ জগতের দিকে চেয়ে ভারতীর অনমনস্ক মন ও প্রকৃতির মিশে যাওয়া রূপ ভাষায় পাই —*'বোধ করি এইমাত্র সূর্যাস্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অন্ধকার হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। নদীর কতক অংশে, এবং পর পারবর্তী গাছপালার উপরে শেষ স্বর্ণাভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; দলে দলে পাখির সারি এদিক হইতে ওদিকে উড়িয়া চলিয়াছে—কাকের কালো দেহে বকের সাদা পালকে, ঘুঘুর*

বিচিত্র পাণ্ডুর সর্বাঙ্গে আকাশের কালো রাঙ্গা আলো মিশিয়া হঠাৎ যেন তাহাদিগকে কোন অজানা দেশের জীব করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি অনুসরণ করিয়া ভারতী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। কি জানি, কোথায় ইহাদের বাসা, কিন্তু সে অলক্ষ্য আকর্ষণ কাহারও এড়াইয়া যাইবার জো নাই। এই কথা মনে করিয়া দুই চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল দূর বৃক্ষশ্রেণির সোনার দীপ্তি নিবিয়া আসিতেছে এবং মাথার উপর গাছপালা নদীতে দীর্ঘতর ছায়াপাত করিয়া জল কালো করিয়া আনিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে হইতে অন্ধকার যেন সুদীর্ঘ জিহ্বা মেলিয়া সম্মুখের সমস্ত আলোক নিঃশব্দে লেহন করিয়া লইতেছে।'[৪৫]— সাধু ভাষায় দীর্ঘ প্রকৃতি বর্ণনা হৃদয়-অনুভবের সংবেদনময়তার স্পর্শে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। *কাকের কালো, বকের সাদা,* ঘুঘুর *বিচিত্র পাণ্ডুর* ও *আকাশের কালো* ও *রাঙা আলো* বর্ণনায় চিত্রময়তা এনেছে। শেষ বেলাকার নদীতীরের প্রকৃতিজগৎ পাখিদের কুলায় ফেরার ব্যস্ততা— সর্বত্রই একটা ভাবময় তন্ময়তা জানা ও চেনা পৃথিবীকে অচেনা অজানা করে তুলেছে। অন্ধকারকে সর্পিল প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে সমাসোক্তি অলংকারে ভাষাকে ব্যঞ্জনাময় করেছেন শিল্পী। ভারতী চরিত্রের বেদনাময় হৃদয়ের আর্তি প্রকৃতিজগতের মধ্যে লীন হয়ে গেছে, দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এই উপন্যাসের শেষে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছবার অভিপ্রায়ে বিপ্লবীদের যে বিঘ্ন সংকুল পথ উত্তরণের দুর্জয় সাহস তা যেন বাহ্যিক প্রকৃতি জগতের তাণ্ডবময় স্বরূপের সঙ্গে হয়ে গিয়েছে। *—'বিদ্যুতে, ঝঞ্ঝায়, প্লাবনে ও বজ্রাঘাতে সে যেন একেবারে প্রলয় শুরু হইয়া গিয়াছিল।'*[৪৬]— সমার্থক শব্দের একাধিক প্রয়োগে বর্ণনা ভাষাময় হয়ে উঠেছে। বিপ্লববাদের অগ্নিমন্ত্র যেন প্রকৃতি জগতে ধ্বনিত হয়েছে। সাধুভাষা বাইরের প্রকৃতিজগৎ ও বিপ্লববাদের মধ্যে সার্থক মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

সব্যসাচী চরিত্রটির দুঃসাহসী আত্মপ্রত্যয়ী মানসিকতা ও সমস্ত প্রকার প্রতিবন্ধতাকে অতিক্রম করার প্রবল অদম্য অভীপ্সার রূপটি বাহ্যিক প্রকৃতির রুদ্রতায় একাত্ম হয়েছে—*'সহসা ভীষণ শব্দে হয়ত কাছে কোথাও বাজ পড়িল, এবং তাহারই সুতীব্র বিদ্যুৎ-শিখা শুধু পলকের জন্যই আকাশ ও ধরাতল উদ্ভাসিত করিয়া একবার শেষ দেখা দেখাইয়া দিল। ... নিমিষ মাত্র পরেই সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া রহিল শুধু নিবিড় অন্ধকার।'*[৪৭]—যৌগিক বাক্যবন্ধে সাধু গদ্যে *সহসা* অব্যয় পদ ব্যবহারে *দেখা* ক্রিয়াপদটির ব্যবহারের বিশেষত্বে প্রকৃতি বর্ণনার ভাষা নাটকীয় ও কাব্যধর্মী হয়ে

উঠেছে। *'রহিল'* ক্রিয়াপদের প্রারম্ভে ব্যবহার গদ্যভাষায় সুরের স্পন্দন এনে দুঃসাহসী মানবের অসাধারণত্বকে ব্যঞ্জিত করেছে। বিপ্লবের কঠিন পথ ও বর্ষণ-সিক্ত পিচ্ছিল দুর্গম পথ বিবৃতিটিতে একাকার হয়েছে।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে কথাশিল্পী দূর আগ্রা শহর, যমুনা নদী ও তার তীরবর্তী মানুষজনের সাজ-পোষাক ইত্যাদির বর্ণনায় প্রকৃতি জগতের আবহ নির্মাণ করেছেন। ভাষাতে তার স্বচ্ছন্দতার সুর ধরা আছে —*'নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্যলব্ধ নারী ও রূপলুব্ধ পুরুষের ভিড় বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুন্দর ও সুদীর্ঘ পথের সর্বত্রই তাহাদের সাজসজ্জা ও বিচিত্র পরিধেয় অস্তমান রবি করে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে তাহার বিশ্বখ্যাত অনন্ত সৌন্দর্যময় তাজের সিংহদ্বারে সম্মুখে আসিয়া যখন উপনীত হইলেন, তখন হেমন্তের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগ অবসানের দিকে যাইতেছে।'*[৪৮]—জটিল বাক্যবন্ধে সহজ ভাবে সাধুগদ্যে শহর ও নদী, মানুষজন অস্ত সূর্যের রক্তাভা—এইচিরন্তন দৃশ্যের পাশাপাশি চিরসৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক তাজমহলের সৌন্দর্যের অসীমত্ব এক হয়ে গিয়ে ভাষাকে তুচ্ছতা মুক্ত করেছে। ভাষায় যেন শাশ্বত প্রকৃতির চিত্র সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে যার তুলনা নেই বললেই চলে।

এই উপন্যাসেই অন্যত্র প্রকৃতির প্রেক্ষিতে মানবমনের গভীরতর সত্যবোধ ভাষায় উদ্ভাসিত— *'আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, হেমন্তের শিশির-সিক্ত মন্দ জ্যোৎস্নায় অদূরে তাজের শ্বেতমর্মর মায়াপুরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তাহার প্রতি কাহারও আর চোখ নাই'*[৪৯] —শুক্লপক্ষে উদ্ভাসিত তাজমহলের মায়াময় রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে প্রেমের চিরন্তনত্ব সম্পর্কিত সংশয় বোধ, নরনারীর হৃদয়ে উদ্ভূত হয়েছে। শিশির-সিক্ত, শ্বেতমর্মর, মায়াপুরী—এই সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দসমন্বিত পদ ব্যবহারে প্রকৃতি বর্ণনা সাধারণ সাধু গদ্যকে অতিক্রম করে চিরকালের সত্যকে স্পর্শ করেছে।

আলোচনা সূত্রে আমরা বলতে পারি যে, শরৎসাহিত্যে প্রকৃতি যেমন অনেক ক্ষেত্রে কাহিনির আবহ নির্মাণে ভূমিকা নিয়েছে আবার পাশাপাশি মানবমনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যঞ্জিত হয়েছে। ভাষাশিল্প নিসর্গ চিত্রণের সার্থক সহায়ক হয়েছে।

নিসর্গ চিত্রণের দক্ষতা সম্পর্কে সমালোচক 'E.M. FORSTER'-র মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি—'Although the weather is a subject upon everybody's tongue, there are very few people, who are capable of taking about it with intelligence and art. Very few writers of fiction-and nearly all of them are recent - have exhibited a mastery of the weather a mastery based at once upon a detailed and accurate observation of natural phenomena and a philosophic sense of the relation between these phenomena and the concern of human beings'[৫০]

শরৎ-উত্তর সাহিত্যে প্রকৃতিচেতনা সমৃদ্ধির পথে এগিয়েছিল ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্য দিয়ে। সাহিত্যে আজও এটি সংবেদনশীল প্রকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে—ভাষাশিল্প সেই ভাবনারই প্রতিফলিত রূপ যা ক্রমেই এক সংশ্লেষণে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। ভাষার এই মাত্রাময় কারুকলায় পাঠকের মুগ্ধতা বেড়েই চলেছে।

বস্তুত এ প্রসঙ্গে কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়ের পথের পাঁচালী, আরণ্যক ও ইচ্ছামতি-র কথা মনে পড়ে যেখানে ঔপন্যাসিকের প্রকৃতিমুগ্ধতা, প্রকৃতিবীক্ষণ, বনপাহাড়-গাছপালা নদী আকাশ মেঘ সূর্যাস্তের রঙ আশ্চর্য ভাষায় চিত্রিত হয়েছে। সেই প্রকৃতি বর্ণনার ভাষা কখনও বা পূর্ববর্তী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের নিসর্গ ভাবনার সঙ্গে কিছুটা একাত্ম। তবে সর্বত্রই মৌলিকতার স্বধর্মে ব্যঞ্জিত যেন।

'আরণ্যক' উপন্যাসে কুশী নদীর অন্যপারের দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্য প্রান্তর, তার রূপ ও সৌন্দর্য নিয়ে ও তার ধ্যানসমাহিত অধ্যাত্ম সম্পদ নিয়ে ভাষাশিল্পে ব্যক্ত হয়েছে এভাবে—*'কতরূপে কত সাজেই বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল। কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্ত মেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশ ভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।'*[৫১]—এ ভাষার বয়নপদ্ধতি ও এ-নিসর্গ ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি শ্রীকান্ত-এর নিসর্গ সম্পর্কিত উপলব্ধিকে মনে করিয়ে দেয়। এ ভাষার ছাঁদ, এর বাক্যাংশগুলির দৈর্ঘ্যের সমতা

বিবৃতিতে ধ্বনিসুষমা এনেছে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তি বক্তব্যে সঙ্গীত মূর্চ্ছনার পাশাপাশি কাব্যময়তা এনেছে। নিসর্গের অপরূপ রূপের সুন্দরের পাশাপাশি ভীষণতাময় করাল মূর্তি এখানে প্রকাশিত।

আবার পূর্ণিয়া যাবার পথে কুশী নদীর তীরবর্তী জঙ্গলের জ্যোৎস্না দেখে সত্যচরণের বিস্ময় বিহ্বলতা ভাষায় ব্যক্ত—*'জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে—সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনও দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা। এমন উন্মুক্ত আকাশতলে—ছায়াহীন উদাস গভীর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না—ক'জন দেখিয়াছে?*'[৭২]—বিস্ময়সূচক চিহ্নের বারবার ব্যবহার, খণ্ড খণ্ড বাক্যাংশ কমা ও ড্যাসের সাহায্যে গ্রথিত করে তৎসম শব্দের সুপ্রয়োগ ও সর্বোপরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বক্তব্য উপস্থিত হয়ে ভাষাকে আবেগময় ও নাটকীয় করে তুলেছে।

সমকালীন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় নিসর্গ মুগ্ধতা বিভতিভূষণের সমধর্মী দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়নি—প্রকৃতি তাঁর রচনায় বিশেষ আবহ নির্মাণ করে গল্পাংশে দ্যোতনা দিয়েছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে হাঁসুলী নদীর তীরবর্তী গ্রাম্য জনপদ, তার নিজস্ব বিশেষ প্রকৃতি জগৎ বর্ণিত হয়েছে এ-ভাষায় —*'হাঁসুলী বাঁকে পৃথিবীর সঙ্গেই যথা নিয়মে রাত্রি প্রভাত হয়। সেখানে ব্যতিক্রম নেই। গাছে গাছে পাখি ডাকে, ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশির বিন্দু ছোট ছোট মুক্তার দানার মত টলমল করে। বাঁশবনের মাথা থেকে বনশিরীষ নিম আর জাম কাঁঠাল শিরীষ বট পাকুড়ের মাথা থেকে টুপটাপ করে শিশির বিন্দু ঝরে পড়ে মাটির বুকে। যে ঋতুতে যে ফুল ফোটার কথা সেই ফুলই ফোটে। পূর্ব দিকে নদীর ধার পর্যন্ত অবারিত মাঠের ওপারে —কোপাইয়ের ওপারে গ্রামে গোপ গ্রামের চারিপাশে গাছপালার মাথায় সূর্য ওঠে।*'[৭৩] —শান্ত সমাহিত প্রসন্ন ভঙ্গিতে নিসর্গ বর্ণনার ভাষাটি ধ্বনিত। ভাষায় প্রকৃতিজগতের চিরন্তন রূপ তার কালজয়ী ছবি চেনা গাছপালা-ফুল-পাখির ডাকে মুখরিত হয়েছে। বাক্যগঠনে এ ভাষায় প্রচলিত রীতি প্রকাশিত।

শরৎ পরবর্তী 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের' রচনাকর্মে নিসর্গ বর্ণনায় মুগ্ধতাজনিত উপলব্ধি প্রকাশিত না হলেও প্রকৃতি তার আপন স্বভাবে উপস্থিত হয়েছে। সে বর্ণনার ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততা পাঠককে বিস্মিত না করে পারেনি। ভাষায় তার প্রকাশ পাই — 'একদিন প্রবল ঝড় হইয়া গেল। কালবৈশাখী কোথায় লাগে। সারাদিন টিপ টিপ বৃষ্টি হইল, সন্ধ্যায় আকাশ ভরিয়া আসিল নিবিড় কালো মেঘ, মাঝরাতে শুরু হইল ঝড়। কী যে বেগ বাতাসের আর কী গর্জন। বড় বড় গাছ মড়মড় শব্দে মটকাইয়া গেল, জেলে পাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসিয়া আসিল, সমুদ্রের মত বিপুল ঢেউ তুলিয়া পদ্মা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তীরে।'[৫৪] — ক্রিয়াপদ বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে ভাষায় ছন্দময়তা এনেছে। মড়মড় ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের ব্যবহার ও 'মটকাইয়া' ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ঝড়ের ধ্বংসাত্মক রূপকে তুলে ধরেছে। ঝড়ের প্রচণ্ডতা পদ্মানদী ও তার পার্শ্ববর্তী মানুষদের জীবনকে কীভাবে বিধস্ত করেছে তারই বর্ণনা ভাষায় যথার্থ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। খেটে খাওয়া মানুষদের লড়াই যে জীবনাধারণের দুমুঠো অন্ন সংগ্রহের জন্যই শুধু সংঘটিত হয় তাই নয়, বিরুদ্ধ প্রকৃতির বিরুদ্ধেও তাদের প্রাণপন অক্লান্ত সংগ্রাম সেটি বর্ণনায় অভিব্যক্ত।

বস্তুত নিসর্গভাবনা ও তার বর্ণনার ভাষা শরৎ-পরর্বতী পর্যায়ে বহুমাত্রিক রূপ পেয়েছে দেখতে পাই। বর্ণনার গুণে ভাষাশিল্প ক্রমেই ঋদ্ধ হয়ে চলেছে। সেই সমৃদ্ধি, সেই গৌরবের মূল্যায়ন পাঠকের কাছেই। নিসর্গ-সম্বন্ধীয় শরৎচন্দ্রের মানসিকতা ও এ-বিষয়ক তাঁর ভাষাশৈলী পরবর্তী প্রজন্মকে আশ্চর্যভাবে প্রভাবিত করেছে দেখা যায় — বর্তমান কথাসাহিত্যের প্রকৃতি বর্ণনার ভাষায় সেই উৎস-মুখের অস্তিত্ব সচেতন পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারেন। এখানেই তিনি আশ্চর্যভাবে চিরন্তন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, বিভূতিভূষণ ঃ মন ও শিল্প; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩; পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৮৯, পৃ. ২৬।

২. বিদ্যাপতি, বৈষ্ণব পদাবলী; উৎস : মধ্যযুগের কবি ও কাব্য - শঙ্করী প্রসাদ বসু, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণি, কলিকাতা - ১৩; সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৬, পৃ. ২৬।

৩. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা - বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ; ৩২, এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৬০, নবম সংস্করণ ১৩৮৭, পৃ. ৮৯।
৪. বিষবৃক্ষ ঃ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ; ৩২ এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৬০, নবম সংস্করণ ১৩৮৭, পৃ. ২৪০।
৫. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, দেবী চৌধুরাণী; প্রথম খণ্ড, ঐ; পৃ. ৭৭১।
৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি (রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী; ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড কলকাতা - ১৭; পুনর্মুদ্রণ ১৪০২; পৃ. ৪০৯।
৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গোরা (রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড); ঐ; পৃ. ৪৬২।
৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ঐ; চতুরঙ্গ (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড)।
৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চতুরঙ্গ (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী; ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড; পুনর্মুদ্রণ ১৪০২; পৃ. ৪৫৯।
১০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) - শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১, আনন্দ পাবলিশার্স; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ২৬৮।
১১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, উৎস ঃ শরৎ চেতনা; শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় , (শরৎচন্দ্রের চিঠি পত্র, গোপাল চন্দ্র রায় কর্তৃক সংগৃহীত), ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ১২; এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি.; প্রথম প্রকাশ ১৩৭৪, পৃ. ৪৫৯।
১২. সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র, শরৎচন্দ্র; ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ১২; এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি., একাদশ সংস্করণ ১৩৮১; পৃ. ১৮৩।
১৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বড়দিদি (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); আনন্দ পাবলিশার্স; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯; ১৪০২ সংস্করণ; পৃ. ২২।
১৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজ বৌ (শরৎ সাহিত্য সমগ্র ১); ঐ; পৃ. ২৪।
১৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, বিরাজ বৌ (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ৫৫।
১৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পরিণীতা (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ৮৭।
১৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পণ্ডিতমশাই (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ১১৩।
১৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পল্লীসমাজ (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ১৮২।
১৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পল্লীসমাজ (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ১৫৮।

২০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, অরক্ষণীয়া (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ২৬৮।
২১. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, দে'জ পাবলিশিং; ১ম সংস্করণ, ১৯৬২; পৃ. ২৩৮।
২২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত - ১ম পর্ব (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ২৭২।
২৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত - ১ম পর্ব (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ২৭৩।
২৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত - ১ম পর্ব (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।
২৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত - ২য় পর্ব (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ৩৩৭।
২৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত - ৩য় পর্ব (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ঐ; পৃ. ৪১৮।
২৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত - ৪র্থ পর্ব; ঐ; পৃ. ৪১৫।
২৮. Boulton Marjarorie, Prose system, Chapter VI, The Anatomy of Prose, Rouledge & Kegan Paul Ltd., Broadway House Carter Lane, London, 1954, p. 49.
২৯. ঘোষ অজিতকুমার, জীবন শিল্পী শরৎচন্দ্র, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা - ৬, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ২৩।
৩০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত/চতুর্থ পর্ব (শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১); ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯; আনন্দ পাবলিশার্স লি.; ১৪০২ সংস্করণ; পৃ. ৪৮৫।
৩১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত/দ্বিতীয় পর্ব (শরৎ সাহিত্য সমগ্র - ১); ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি.; ১৪০২ সংস্করণ; পৃ. ৩৩১।
৩২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত/চতুর্থ পর্ব (শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১), ঐ; পৃ. ৫১৯।
৩৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন (শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১), ঐ; পৃ. ৭৩৬।
৩৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, চরিত্রহীন (শরৎ সাহিত্য সমগ্র- ১), ঐ; পৃ. ৭৫৩।
৩৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দত্তা (শরৎ সাহিত্য সমগ্র- ১), ঐ; পৃ. ৮৪৭।
৩৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দত্তা; ঐ; পৃ. ৮৫৪।
৩৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দত্তা; ঐ; পৃ. ৭৮৯।
৩৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দত্তা; ঐ; পৃ. ৭৯৩।
৩৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ (শরৎ সাহিত্য সমগ্র- ১), ঐ; পৃ. ৮৭০।

৪০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ (শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১), ঐ; পৃ. ৮৮৬।
৪১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ (শরৎ সাহিত্য সমগ্র -১), ঐ; পৃ. ৯৫৫।
৪২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দেনাপাওনা; ঐ; পৃ. ১০৮৭।
৪৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, দেনাপাওনা; ঐ; পৃ. ১০৮৭।
৪৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পথের দাবী - শরৎ সাহিত্য সমগ্র -২, ঐ; পৃ. ১১৫৫।
৪৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পথের দাবী (শরৎ সাহিত্য সমগ্র -২); ঐ; পৃ. ১২৬৫।
৪৬. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পথের দাবী (শরৎ সাহিত্য সমগ্র- ২); ঐ; পৃ. ১২৬৫।
৪৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পথের দাবী (শরৎ সাহিত্য সমগ্র -২); ঐ; পৃ. ১২৬৫।
৪৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শেষ প্রশ্ন (শরৎ সাহিত্য সমগ্র- ২); ঐ; পৃ. ১২৭৯।
৪৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শেষ প্রশ্ন (শরৎ সাহিত্য সমগ্র -২); ঐ; পৃ. ১২৮৪।
৫০. Forster E.M., Aspect of the Novel, Materials and Mathods of Fiction Penguin Books Ltd. 80, Street London England, 1927, p. 180.
৫১. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ১২, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৩, দশম মুদ্রণ ১৪০০, পৃ. ১৭।
৫২. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ১২, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৩, দশম মুদ্রণ ১৪০০, পৃ. ৭০।
৫৩. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি.; ১৪ বি. বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট; কলকাতা - ৭৩; প্রথম সংস্করণ ১৩৫৪; আঠাশতম মুদ্রণ ২০০৮; পৃ. ৬০–৬১।
৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পদ্মানদীর মাঝি; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ১৪ বি. বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩; চতুর্বিংশ মুদ্রণ ১৪১১; পৃ. ৪৬।

_____****_____